ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY
2006

ARTICLES

Dower in history and it's significance in Islamic law

The Emergence of Plantation Labour in Bengal: A historical and legal study

The Convention on the Rights of the Child, 1989: Its Success or Failure after 17 years

The concept of Islamic Law and its application in Bangladesh

Hiring and Firing of Securities Regulators in Bangladesh and Australia: A Comparative Review

Rights and Care for Elderly People : Bangladesh Perspective

The Law of Maintenance and its Implementation in Bangladesh: A Comparative Study

The Nexus between Electronic and Paper Evidence under the Evidence Act, 1872

Inheritance of Orphan Grandchildren under Islamic law of Succession: A study of the impact of section 4 of the Muslim Family Laws Ordinance, 1961

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কতিপয় গুরত্বপূর্ণ কমিটি: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের শিকস্তি ও পয়স্তি আইন : একটি পর্যালোচনা

ইসলামে মোহরানার অধিকার ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ একটি পর্যালোচনা

সাইবার ক্রাইম : আইন প্রয়োগ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান

শিশু নির্যাতন এবং শিশু অধিকার ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ এর প্রভাব ঃ একটি আইনী পর্যালোচনা

Abstract on the Project Legal Rights of the Child: Policy and Enforcement in Bangladesh, 1995

Scanned with CamScanner

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

Volume 03 2006

Published by:
Dean
Faculty of Law
Rajshahi University
Rajshahi- 6205
Bangladesh

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF RAJSHAHI

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2006

Editorial Board

Editor **Professor Dr. Begum Asma Siddiqua**
Dean, Faculty of Law, RU

Member **Professor Dr. A B Siddique**
Department of Law & Justice, RU

Professor A F M Mohsin
Department of Law & Justice, RU

Dr. Mohammad Abdul Hannan
Department of Law & Justice, RU

Sayeeda Anju
Department of Law & Justice, RU

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal

FACULTY OF LAW

UNIVERSITY OF RAJSHAHI

Volume 03 2006

Published by
Dean
Faculty of Law
Rajshahi University
Rajshahi- 6205
Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by
B T S Commercial Institute
Benodpur Bazar, Rajshahi

Printed at:
Barendra Printing Press & Packaging
Sapora, Rajshahi

Subscription Rates
For Individuals: **Tk. 100.00 US$ 20** (without postage)
For Organisation: **Tk. 150.00 US$ 30** (without postage)

[Published in December 2006]

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2006

Authors' Name	Article	Page
Dr. Begum Asma Siddiqua	Dower in history and it's significance in Islamic law	1-10
Dr. Md. Gholam Kibria	The Emergence of Plantation Labour in Bengal: A historical and legal study	11-22
Dr. Mohammad Abdul Hannan M. Ahsan Habib	The Convention on the Rights of the Child, 1989: Its Success or Failure after 17 years	23-36
Dr. Muhammad Faiz-ud-Din	The concept of Islamic Law and its application in Bangladesh	37-46
Dr. S M Solaiman	Hiring and Firing of Securities Regulators in Bangladesh and Australia: A Comparative Review	47-70
Md. Ahsan Kabir	Rights and Care for Elderly People : Bangladesh Perspective	71-84
Md. Delower Hossain	The Law of Maintenance and its Implementation in Bangladesh: A Comparative Study	85-96
Zulfiquar Ahmed	The Nexus between Electronic and Paper Evidence under the Evidence Act, 1872	97-112
Muhammad Ekramul Haque	Inheritance of Orphan Grandchildren under Islamic law of Succession: A study of the impact of section 4 of the Muslim Family Laws Ordinance, 1961	113-124
ড. রাকিবা ইয়াসমিন	পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কমিটি: একটি পর্যালোচনা	125-144
মো. আব্দুল আলীম	বাংলাদেশের শিকস্তি ও পয়স্তি আইন : একটি পর্যালোচনা	145-156
মো. আব্দুর রহিম মিয়া	ইসলামে মোহরানার অধিকার ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ একটি পর্যালোচনা	157-178
মুসতাক আহমেদ মো. সাহাল উদ্দীন	সাইবার ক্রাইম : আইন প্রয়োগ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান	179-200
সালমা আখতার খানম	শিশু নির্যাতন এবং শিশু অধিকার ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	201-222
মোসা. সাঈদা আঞ্জু সারাওয়াত রশীদ	বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ এর প্রভাব ঃ একটি আইনী পর্যালোচনা	223-238
A F M Mohsin	Abstract on the Project Legal Rights of the Child: Policy and Enforcement in Bangladesh, 1995	239

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal, 2006: **201-222**

শিশু নির্যাতন এবং শিশু অধিকার ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সালমা আখতার খানম*

ABSTRACT

Children are the youngest member of a family as well as a country. The child is the father of a nation. But they are one of the most vulnerable group in respect of violence in Bangladesh. At present the rate of under 14 years old child of total population are 45 percent in our country. Among them about 23 percent are male child and 22 percent are female child. For the protection of this child there are about 25 laws in our country. Besides that there are some provisions in Bangladesh Constitution for establishing child rights. On the other hand Bangladesh is one of the signatories of the Convention on the Rights of the Child which was adopted by the United Nations Organisation in 1989. Inspite of this, torture of a child are increasing day by day. They are deprived of their rights. For them life is a daily struggle to survive whether they live in urban or rural area. For these children, childhood as a time to grow, learn, play and feel safe is basically meaningless. Many times death is the last consequence for them. They are prone to torture in every walk of life. At home, in schools, in park, at working places and everywhere they roam, it is not secure for them. This article has discussed child rights, types of torture of a child and some realities of life. At the end it has suggested some recommendations to ensure child rights.

ভূমিকা

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতি। মানবের জন্য স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ উপহার একটি সন্তান - একটি শিশু। একটি শিশুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে পরিবারের সুখ, সমাজের শান্তি, দেশের ভবিষ্যৎ। শিশু সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালোবাসা অর্থ দিয়ে পরিমাপযোগ্য নয়। কি ধনী কি গরীব সকল পিতা-মাতার চোখের মনি তার শিশু সন্তানটি। আমাদের ভবিষ্যতের সব চাইতে মূল্যবান সম্পদ আমাদের শিশুরা। কিন্তু দেশের বাস্তব চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রতিটি মুহুর্তে শিশুরা নানাভাবে নির্যাতিত, লাঞ্চিত এবং অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। মানুষরূপি কিছু সমাজের কীট শিশুদের ফুলের মত সুন্দর জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিচ্ছে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যতকে পুরোপুরি থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার জীবনের বিনিময়ে আর নয়তো অভিশাপে পরিণত করছে স্বাভাবিক জীবন থেকে দূরে সরিয়ে। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশু। এই ৪৫ ভাগের মধ্যে পুরুষ শিশুর হার প্রায় ২৩ ভাগ এবং মেয়ে শিশুর হার প্রায় ২২ ভাগ। এই শিশুদের নিরাপত্তা, রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার

---

*প্রভাষক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমনঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এ বর্ণিত আছে যে, "নারী বা শিশুর অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।" এছাড়াও সংবিধানের অপর কয়েকটি অনুচ্ছেদে শিশু সংক্রান্ত বিধান সংযুক্ত। ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভ নিশ্চিত করা। ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ১৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব বলে গণ্য করবে। বাংলাদেশে প্রায় ২৫টি আইন শিশু অধিকার সংরক্ষণে বলবৎ আছে।

তাছাড়া ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ একটি স্বাক্ষরদাতা রাষ্ট্র। এছাড়াও শিশুদের নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য ১৯৯৫ সনে ১৮ নম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন করা হয়েছিল। অপরাধের জন্য কঠোর সাজার প্রয়োজন বিধায় এবং অপরাধের কৌশল পরিবর্তনের ফলে পরবর্তীতে নতুন আইন প্রয়োজন হলে ২০০০ সালে রচিত হয় ৮ নম্বর শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০।

কিন্তু এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশে শিশু নির্যাতন দিন দিন বেড়েই চলছে। নানাভাবে তাদের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আলোচ্য লেখনিতে শিশু অধিকার, শিশু নির্যাতনের ধরণ এবং কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হলো।

শিশুর সংজ্ঞা

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত ১৯৮৯ সালের শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে সবাই শিশু। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিশু সম্পর্কিত সকল আইন, নীতি ও চর্চা ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

বাংলাদেশে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার মত শিশুর কোন একক সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন নীতি ও আইনের মধ্যে এই সংজ্ঞায় তারতম্য রয়েছে। যা সনদের সংজ্ঞার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে শিশুদেরকে বিভিন্ন বয়স স্তরে (১৮ বছরের অনেক নীচে) কতিপয় নীতি ও বিধির অধিনে নিম্ন বর্ণিত বিশেষ কিছু সুরক্ষা বা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে।

- ৯ বছরের নীচে কোন অপরাধের দায়িত্ব আরোপ করা হয় না।
- ৬ থেকে ১০ বছর - স্কুলে যেতে হবে।
- ১২ বছরের নীচে দোকান, অফিস, হোটেল বা কোন ওয়ার্কশপে কাজ করতে পারবে না। (শিক্ষানবীশ ব্যতিত)

- ১৪ বছরের নীচে কলকারখানায় কাজ করতে পারে না।
- ১৪ বছরের নীচে শিশু ভবঘুরেদের প্রাপ্ত বয়স্কদের কাছ থেকে পৃথক রাখতে হবে। এবং জাতীয় শিশু নীতির আওতায় অধিকার সংরক্ষিত।
- ১৫ বছরের নীচে পরিবহন খাতের কয়েকটি অংশে কাজ করতে পারে না।
- ১৬ বছরের নীচে সাধারণ কারাগারে আটক রাখা যাবে না, কিংবা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না এবং মেয়েরা দৈহিক মিলনে সম্মতি দিতে পারে না।
- ১৮ বছরের নীচে মেয়েরা বিয়ে করতে পারে না এবং ১৮ বছর হলো প্রাপ্ত বয়স্ক বিবেচিত হওয়ার বয়স।
- ২১ বছরের নীচে ছেলেরা বিয়ে করতে পারে না।

ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে বয়:সন্ধি লাভের পর থেকেই শৈশবের সমাপ্তি ঘটে।

আবার বাংলাদেশে প্রচলিত সাধারণ সাংস্কৃতি/ধারণা যে ১৮ বছর বয়সের অনেক আগেই শৈশবের সমাপ্তি ঘটে।[১]

নির্যাতন

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984-এ Part-1 এবং Article-1 এ নির্যাতনের সংগায় বলা হয়েছে -

> For the purpose of this convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person has committed or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.[2]

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এ শিশু নির্যাতন সম্পর্কে শাস্তির বর্ণনা করতে গিয়ে নির্যাতনের কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলোতে সংঘটিত অপরাধগুলি শিশু নির্যাতন হবে এবং এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। নির্যাতনের ক্ষেত্রগুলো হলো -

---

[১] "বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার", ইউনিসেফ, ঢাকা, পৃ: ৯-১০।

[2] Muhammad Zamir, *Human Rights Issues and International Law*, University Press Ltd, Dhaka, 1990, p. 195.

Scanned with CamScanner

(১) যদি কোন ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশুর মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশুকে এমনভাবে আহত করে যার ফলে উক্ত শিশুর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয় বা শরীরের কোন অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা তার শরীরের অন্য কোন স্থান আহত হয়।

(৩) কোন ব্যক্তি যদি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ কোন শিশুর উপর নিক্ষেপ করে বা নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে এবং উক্ত নিক্ষেপের ফলে কোন শিশুর শারিরীক, মানসিক বা অন্য কোন ভাবে কোন ক্ষতি না হলেও।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনী বা নীতি বিবর্জিত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ হতে আনয়ন করে বা বিদেশে প্রেরণ বা পাচার করে অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করে বা উক্তরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখে।

(৫) যদি কোন ব্যক্তি কোন নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল, শিশু বা মাতৃসদন, নার্সিং হোম, ক্লিনিক ইত্যাদি বা সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকের হেফাজত হতে চুরি করে।

(৬) যদি কোন ব্যক্তি উল্লেখিত অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে অপহরণ করে।

(৭) যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে আটক করে।

(৮) যদি কোন পুরুষ কোন শিশুকে ধর্ষণ করে। এখানে আরো বলা হয়েছে চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের কোন শিশুর সাথে তার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করে। তাহলে উক্ত ব্যক্তি নারীকে ধর্ষণ করেছে বলে গণ্য হবে।

(৯) যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ পরবর্তী তার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিতা শিশুর মৃত্যু ঘটে।

(১০) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন শিশুকে ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণের ফলে উক্ত শিশুর মৃত্যু ঘটে বা সে আহত হয়।

(১১) যদি কোন ব্যক্তি কোন শিশুকে ধর্ষণ করে মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করে।

(১২) যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত, পা, চক্ষু বা অন্য কোন অঙ্গ বিনষ্ট করে বা অন্য কোন ভাবে বিকলাংগ বা বিকৃত করে।[৩]

[৩] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০।

শিশু অধিকার

শিশু অধিকার সম্বন্ধে জানার আগে অধিকার কাকে বলে তা জেনে নেওয়া দরকার। মানব শিশু হলো একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষুদে মানুষ। একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত অধিকারগুলো ভোগ করে সেগুলো হলো মানবাধিকার বা মানুষের অধিকার। একজন মানুষ জন্মের সাথে সাথে কতগুলি অধিকার অর্জন করে। এগুলো তার জন্মগত অধিকার বা সহজাত অধিকার। যেমন মাতৃদুগ্ধ পান করার অধিকার। এ সমস্ত অধিকারগুলো আইনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। এ অধিকারগুলো লঙ্ঘন হলে দেশের প্রচলিত আইনে প্রতিকার পাওয়ার কোন বিধান নেই। কতগুলি অধিকার আছে যা দেশের সংবিধানে প্রতিষ্ঠিত। এগুলোকে বলে মৌলিক অধিকার। এই অধিকার হলো রাষ্ট্রপ্রদত্ত সেই সকল সুযোগ সুবিধা যা নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। অর্থ্যাৎ মৌলিক অধিকারের মাধ্যমেই জনগণ তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করতে পারে। নাগরিকদের প্রতিভার বিকাশ ও জীবনের যথাযোগ্য প্রকাশের জন্য মৌলিক অধিকার অবশ্যই প্রয়োজন। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয়ভাগে নাগরিকগণকে মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে আছে আইনের চোখে সমতা, আইনের নিরাপত্তা লাভের অধিকার ইত্যাদি। আবার কতগুলি অধিকার আছে যা দেশের প্রচলিত আইনে প্রতিকারযোগ্য এবং আইনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এগুলোকে বলে আইনগত অধিকার। যেমন- চুক্তি করার অধিকার। এবার আসা যাক শিশু অধিকার বিষয়ে। শিশুদের জন্য রক্ষিত অধিকারসমূহ শিশু অধিকার। প্রশ্ন জাগতে পারে শিশুদের আবার কিসের অধিকার। কেউ কখনও শিশুর খারাপ চায় না। বড়রা সব সময়ই শিশুদের মঙ্গলের জন্যই কাজ করে। তবে এর পরেও কথা থেকে যায়। বাস্তবতা অন্য কথা বলে। সচেতন বা অসচেতন যে ভাবেই হোক শিশুদের উপর নানাভাবে নির্যাতন হতে থাকে। শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন অনেক সময় শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও কেড়ে নেয়। শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে সর্বসম্মতিক্রমে 'শিশু অধিকার সনদ' নামে একটি দলিল পাশ হয়। বাংলাদেশও এই দলিলে স্বাক্ষরদাতা একটি দেশ। এই শিশু অধিকার সনদটির একটি বিশেষত্ব হলো এটা শুধু শিশুদের অধিকারের কথাই বলেনি বরং বাস্তবায়নের উপায়ও বলে দিয়েছে। সর্বোপরি জাতিসংঘের কাছে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের দায়বদ্ধতার বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছে। এই সনদে মোট ৫৪টি অনুচ্ছেদ আছে। তার মধ্যে ১-৪১ পর্যন্ত প্রথম পরিচ্ছেদ যেখানে শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করাসহ সকল প্রকার শোষণ, বৈষম্য, অবহেলা এবং নির্যাতন থেকে তাদের রক্ষার বিবরণ রয়েছে। সনদে অধিকারগুলোকে চারটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে -

Scanned with CamScanner

১. বেঁচে থাকার অধিকারঃ এর মধ্যে রয়েছে জীবন ধারণে সহায়ক মৌলিক বিষয়াদির অধিকার, যেমন- স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ।

২. বিকাশের অধিকারঃ এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার অধিকার, শিশুর গড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত জীবন যাত্রার মান ভোগের অধিকার এবং অবকাশ যাপন, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার।

৩. সুরক্ষার অধিকারঃ এই শ্রেণীতে রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে শিশুদের অধিকারসমূহ যেমন, শরণার্থী শিশু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু এবং শোষণ, নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন শিশু।

৪. অংশগ্রহণের অধিকারঃ এর মধ্যে রয়েছে শিশুদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার, অন্যদের সাথে অবাধে সম্পর্ক গড়ে তোলার অধিকার এবং তথ্য ও ধারণা চাওয়া, পাওয়া ও প্রকাশের অধিকার।[৪]

বাংলাদেশে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় গৃহিত কিছু পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ১৯৯০ সনের আগষ্ট মাসে শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নির্যাতন প্রতিরোধে সনদ বাস্তবায়নের দীর্ঘ পথে সরকারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে -

- ১৯৯৪ সনে জাতীয় শিশু নীতি গ্রহণ। জাতীয় শিশু নীতিতে শিশুদের জীবণ রক্ষা, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিকাশ, পারিবারিক পরিবেশ আইনগত অধিকার এবং সংকটজনক পরিস্থিতিতে শিশুদের বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।[৫]
- ১৯৯৫ সনে জাতীয় শিশু পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের প্রধান কাজ নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ এবং শিশু বিষয়ক আইন বলবৎ করা।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শিশুদের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০২ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মেয়ে শিশুদের বিশেষ বিবেচনায় রেখে সরকার বিনা খরচে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার নীতি ঘোষণা করেছে।[৬]
- শিশুদের স্কুলগামী করার জন্য উৎসাহ হিসাবে সরকার 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' (গম) প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেছে।[৭]

---

[৪] জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী।

[৫] www.yahoo.com "National Policy on Child in Bangladesh."

[৬] ঐ

[৭] ঐ

- বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সরকার ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় জাতীয় টিকাদান কর্মসূচী, বিশুদ্ধ পানীয় পান ও পয়:নিস্কাশনের নিমিত্তে সমগ্র বাংলাদেশে কর্মসূচী চালু রেখেছে।[৮]
- নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সরকার কঠোর আইন চালু করেছে যা 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০' নামে অভিহিত।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ও স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ে শিশু নির্যাতন রোধে বিশেষ সেল খোলা হয়েছে।
- শিশু পাচার রোধের উদ্দেশ্যে সরকার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে।[৯]
- শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে।
- মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ৬৪টি জেলায় ও ৬টি উপজেলায় শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- ২০০১ থেকে ২০১০ সাল শিশু দশক হিসেবে পালিত হচ্ছে।[১০]
- প্রতি বৎসর ২৯শে সেপ্টেম্বর হতে ৫ই অক্টোবর দেশব্যাপি শিশু অধিকার সপ্তাহ পালিত হয়।
- সকল জেলাতে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে শিশু অধিকার মনিটরিং ফোরাম গঠিত হয়েছে।

বেসরকারী উদ্দ্যোক্তারও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশে কতিপয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) শিশুদের বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নে কার্যরত আছে। এদের মধ্যে ব্রাক (Bangladesh Rural Advancement Committee) নন-ফরমাল এডুকেশন এর মাধ্যমে সারাদেশে ৩৪,৫০০ বিদ্যালয়ে অনুর্ধ্ব ১০ বছর বয়সী শিশুদেরকে শিক্ষা প্রদান করছে।[১১] 'ইউসেপ' (Underprivileged Children's Educational Programme) নামক অপর একটি এনজিও সারাদেশে তাদের কারিগরী ও সাধারণ শিক্ষা অনুর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রদান করছে, যেখানে প্রচুর শ্রমজীবী শিশু শিক্ষা/প্রশিক্ষণরত আছে (ইউসেপ, ১৯৯৫)। 'সেভ দা চিলড্রেন' নামে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা কর্তৃক পরিচালিত তিনটি প্রতিষ্ঠান এদেশে শিশুদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে বহুপ্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। 'ইউনিসেফ' (United Nations Children's

---

[৮] ঐ

[৯] ঐ

[১০] ঐ

[১১] www.unesco.org/courier/2000, p. 2.

Emergency Fund) এর বাংলাদেশ দপ্তর থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, ইপিআই কর্মসূচী প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য অর্থের যোগান দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আরো অনেকগুলো বেসরকারী দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান এদেশে শিশু উন্নয়ন কার্যক্রমে রত আছে। এগুলোর কার্যক্রমে সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ 'শিশু অধিকার ফোরাম' নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের বাস্তব অবস্থা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দুর্নীতিতে শীর্ষ স্থান অধিকারী এই দেশ সব দিক থেকে পিছিয়ে আছে। ইউনিসেফের 'বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০৬' শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে দেড় কোটিরও বেশী শিশু সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলাদেশে ৫ ধরণের শিশু বর্জনের শিকার। এদের মধ্যে রয়েছে রাস্তায় বসবাসকারী শিশু, বস্তিতে বসবাসকারী শিশু, গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত শিশু, স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে এমন কর্মজীবী শিশু এবং আনুষ্ঠানিক জন্ম নিবন্ধনহীন শিশু। কিন্তু শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় সকল স্তরের শিশুই নানাভাবে নির্যাতিত হয়। আলোচনার সুবিধার্থে কতগুলি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নির্যাতনের ধরণ ও বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হলো।

বিদ্যালয়ে নির্যাতন

শিশুর বিকাশের জন্য অন্য যেসব বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত সেগুলো হচ্ছে শিক্ষা, বিশ্রাম এবং অবকাশের অধিকার। শিশু অধিকার সনদের ২৭ ধারায় শিশুর জীবন যাত্রার এমন একটি মানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যা তাদের পূর্ণ বিকাশের অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিকের জন্য সহায়ক।

কিন্তু দেশ এখন এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে যেখানে পড়ালেখায় কোন আনন্দ নেই। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট পড়ানোর প্রতি বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। যে ছাত্র-ছাত্রী তাদের কাছে প্রাইভেট পড়ে তাদের সাজেশন সরবরাহ করা হয়। এই সব সাজেশনের জন্য এবং অতিরিক্ত পড়াশুনার চাপের কারণে শিক্ষার্থীরা স্কুলের প্রতিও আগ্রহ হারাচ্ছে। পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ শিশুদের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে চেষ্টা না করে সারাক্ষণ তাদের উপর পড়াশুনার চাপ দিতে থাকে এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করতে না পারলে নানাভাবে মানসিক নির্যাতন করে থাকেন। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বাধ্য হয়েই নকলের প্রতি ঝুকে যাচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষক নির্বাচনের জন্য কোন সঠিক পদ্ধতি নেই। বাংলাদেশের প্রাইমারী বিদ্যালয় ১ম হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬ষ্ঠ

Scanned with CamScanner

হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত। এই সব শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স বেশীর ভাগ ৬ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। এই শিশুগুলোর সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে, তাকে কিভাবে মনযোগী করে তুলতে হবে, শাস্তির মাত্রা কতটুকু হবে এমন কোন ট্রেনিং বা শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের শিক্ষকদের দেওয়া হয় না। ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলোর শিক্ষক নিয়োগে কি নিয়ম কানুন অনুসরণ করা হচ্ছে তা ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছাড়া আর কেউ জানে না। সেটা জানার কোন উপায়ও নেই। কারণ তাদের জবাবদিহিতার সঠিক কোন ম্যাকানিজম নেই। তাই শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীর মন মানসিকতার দিকে সামান্যও নজর দেন না। আর এজন্য বুশরার মত শিশুরা অকালেই ঝরে যায়।

বুশরা আহমেদ, মানারাত আন্তর্জাতিক স্কুল ও কলেজের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী। ৪ জুন ২০০৬ ফাইনাল পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে সে শিক্ষকের হাতে ধরা পড়ে। এ নিয়ে শিক্ষকরা তার সাথে খারাপ আচরণ করেন ও এ বিষয়টি অভিভাবককে জানাবে বলে হুমকি দেন। নিজের আত্মসম্মান বাঁচাতে বুশরা তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।[১২]

এ প্রসঙ্গে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মোহিত কামাল বলেন -

> সাধারণত টিন এজ বয়সের ছেলেমেয়েরা একটু বেশী আবেগ তাড়িত হয়। এসময় তারা যে কোন ঘটনাকে সহজে মেনে নিতে পারেনা। এ বয়সের ছেলেমেয়েদের সাথে বুঝে শুনে ব্যবহার করা উচিৎ তাদের সঙ্গে যে কোন কাজ সতর্কতার সঙ্গে করা উচিৎ নকল ধরাকে কেন্দ্র করে শিক্ষক বুশরার সঙ্গে যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে তা মোটেও ঠিক হয়নি। শিক্ষকের নিষ্ঠূরতা বুশরাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দিয়েছে।[১৩]

প্রথম আলো সম্পাদকীয় উঠে এসেছে শিমুল নামে ১০ বছরের এক শিশুর কথা। মা বাবাকে ছেড়ে মাদ্রাসায় একা মন টিকছিল না তার। ক্লাস শেষে তাই বিকালবেলায় সে খালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল। এই তুচ্ছ ঘটনাটি ছিল তার বিরাট অপরাধ যার শাস্তি নির্ধারিত হয়েছিল ১৫০ বেত্রাঘাত। এই সাজার ফলে শিশু শিমুলের হাতের ও পিঠের চামড়া উঠে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। শুধু বেত্রাঘাত করেই শাস্তিদাতারা ক্ষান্ত হননি। রাতভর খুটির সঙ্গে বেধে রাখা হলো শিশুটিকে। শিশু নির্যাতনের এ ঘটনা কোন সভ্য দেশে আশা করা যায় না।[১৪]

---

[১২] *রোববার*, ১১ জুন ২০০৬, পৃ: ১৫-১৭।

[১৩] ঐ।

[১৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ জুলাই, ২০০৬।

শিশু শ্রমের মাধ্যমে নির্যাতন

২০০৫ এর সেপ্টেম্বরে ডিডিএফ (Dhaka Development Foundation) দেয়া ইউনিসেফের প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব এবং শিশুশ্রম বন্ধের জন্য সঠিক নীতিমালা না থাকায় দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ মূহুর্তে শুধু ঢাকা শহরেই শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৫ লাখ। ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী এসব শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।[১৫]

প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে, বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ১২ ভাগ, এদের ছয় ভাগ মেয়ে শিশু। ঢাকা শহরে শুধু গৃহ-পরিচারিকার কাজে নিয়োজিত আছে ৩ লাখ মেয়ে শিশু। গ্রামাঞ্চলেও শিশু শ্রমিকের একটা বিরাট অংশ কাজ করছে। এদের মধ্যে শতকরা ৭৪ ভাগ কৃষিকাজে এবং ১৬ ভাগ বাসা-বাড়িতে গৃহ পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত। অন্যদিকে দেশের গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত ১৫ লাখ নারী শ্রমিকের একটি বিরাট অংশেরই বয়স ১৪ বছরের নীচে। শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য মতে, দেশে মোট শিশুর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। আর শিশু শ্রমিকের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযোজিত আছে ৫৪.৩০ ভাগ। শহর এলাকায় কর্মরত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৮০ হাজার।

২৯ সেপ্টেম্বর হতে ৬ অক্টোবর ১৯৯৭ শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে 'শিশুদেরও অধিকার আছে' তথ্য কনিকায় বলা হয়েছে-

শিশুদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং ক্ষতিকর কাজ করা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। যে কাজগুলো শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ তার মধ্যে রয়েছে বিপজ্জনক ধরণের কাজ, শিশুদের শিক্ষায় বাধা সৃষ্টি করে এমন ধরণের কাজ অথবা তাদের স্বাস্থ্য ও বিকাশের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজ। কাজটি শিশুর শারিরীক, যৌন অথবা আবেগগত নির্যাতনের মুখো-মুখি করতে পারে। এর মধ্যে থাকতে পারে মৌখিক নির্যাতন, প্রহার অথবা ধর্ষণ। বিশেষ করে গৃহভৃত্য এবং রাস্তায় কাজ করা শিশুরা এ ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। আবার কাজের অবস্থা শোষণমূলক হতে পারে। যেমন কাজের সময় খুবই দীর্ঘ হতে পারে। শিশুদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক অথবা সবেতন ছুটি না দেওয়া হতে পারে। শিশু শ্রমের অন্যতম বিপজ্জনক ধরণ হচ্ছে যৌন কর্মী হিসেবে শিশুদের শোষণ। শিশু যৌনকর্মীরা শারিরীক নির্যাতনের শিকার হওয়া এবং সমাজকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া ছাড়াও যৌন সংক্রমিত বিভিন্ন রোগ এবং অনাকাংখিত গর্ভধারণসহ মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখিন হয়।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম সম্পর্কিত কয়েকটি আইন বিশেষভাবে বিপজ্জনক কাজের ব্যাপারে প্রণীত। ১৮ বছরের কম বয়সীদের যথাযথ নির্দেশনা, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ

---

[১৫] রোববার, ১৪ই মে, ২০০৬, পৃ. ২৪, ২৫।

বা তত্ত্বাবধান ছাড়া বিপজ্জনক মেশিনে কাজ করা নিষিদ্ধ। যেখানে বিপজ্জনক কাজ হয় এগুলোর মধ্যে রয়েছে বয়ন কাজ, চামড়া পাকা করার কাজ এবং বিড়ি, সাবান, কার্পেট, ম্যাচ বিস্ফোরক অথবা আতশবাজি তৈরীর কাজ। সার্কের সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০০০ সাল নাগাদ বিপজ্জনক পেশায় শিশু শ্রমের বিলোপ সাধনের লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু তারপরও থেমে নেই শিশুশ্রম এবং শিশু নির্যাতন।

রাজশাহী বোয়ালিয়া থানার রাজারহাতা এলাকার বাসিন্দা এ্যাডভোকেট ইদ্রিশ আলীর বড় ছেলে ব্যবসায়ী ফারুক জামিলের মেঝেতে গৃহপরিচালিকা শিরিণের (১৫) লাশ পাওয়া যায়। গৃহকর্ত্রী ফারুকের স্ত্রী নাসরীন সুলতানা দীপাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি পুলিশকে জানান দীর্ঘদিন বাড়ীতে যেতে না পারার কারণে মনের দু:খে কাজের মেয়ে তার অনুপস্থিতিতে ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু এলাকাবাসী এই আত্মহত্যার ঘটনাকে সাজানো এবং তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে বলে দাবী করে। তারা বোয়ালিয়া থানা ঘেরাও করে বিচার দাবী করে। পুলিশ ঘটনাস্থলেই লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী করে। পুলিশের সুরতহাল রিপোর্ট অনুযায়ী শিরিনের বুকে ও বাম হাতের দুই স্থানে ক্ষতের চিহ্ন আছে এবং ধর্ষণের আলামতও পাওয়া গেছে। এলাকাবাসীর ভাষ্য অনুযায়ী শিরিনকে গৃহকর্ত্রী প্রায়ই মারধর করত। প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে গৃহকর্ত্রী দীপাসহ তার স্বামীকে সতর্ক করে। এমনকি কাজের মেয়ের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবীতে এলাকার যুবকরা দীপার বিরুদ্ধে এলাকায় পোষ্টারিংও করে।[১৬]

রাষ্ট্রীয় নীতি অনুযায়ী আমাদের দেশে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৪ নম্বর অনুচ্ছেদে জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ধারা ৩৪(১) এ বলা হয়েছে ১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকে কোন পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা যাবে না বা কাজ করতে দেওয়া যাবে না। ধারা ৩৫-এ বলা হয়েছে, শিশুরা মাতা-পিতা বা অভিভাবক শিশুকে কোন কাজে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করে কোন চুক্তি করতে পারবে না। আবার ধারা ৪৪-এ বলা হয়েছে, বার বৎসর বয়:প্রাপ্ত কোন শিশুকে এমন কোন হালকা কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে যা তার স্বাস্থ্য ও উন্নতির জন্য বিপজ্জনক নয় অথবা যা তার শিক্ষা গ্রহণকে বিঘ্নিত করবেনা। কিন্তু বাস্তবতা অন্য কথা বলে। বাংলাদেশে ১৩ লাখ শিশু এখন ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিযুক্ত রয়েছে। ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সে মোট শ্রমজীবী শিশুর ৯৩.৩ শতাংশ ইনফরমাল সেক্টরে কাজ করে। ২০১৫ সালের

---

[১৬] তথ্যভিত্তিক গ্রন্থনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৪।

মধ্যে বাংলাদেশ থেকে শিশুশ্রম দূর করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তারা আইএলও (International Labour Organisation) এর সঙ্গে কাজ করছে।[১৭] এদেশে মোট ৪ কোটি শ্রমিকের মধ্যে অন্তত ৭০-৮০ লাখ শিশু শ্রমিক রয়েছে।[১৮] বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তবতাই শিশুদের শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে বাধ্য করছে। এদেশের অসংখ্য দরিদ্র পরিবারে অধিক সন্তানের ভারে ন্যুজ মা-বাবাকে সহায়তা করতে শিশুদের রোজগারের ধান্ধা করতে হয়। তাছাড়া সন্তানদের লেখা-পড়া করানোর সাধ্যও এসব বাবা-মায়ের থাকে না। নারী-প্রধান অনেক পরিবার, যেখানে স্বামী পরিত্যাক্তা কিংবা বিধবা নারী সন্তান কিংবা মা-বাবাকে নিয়ে থাকে, সেখানে শিশুদের শ্রম দিতে হয়। আবার অভিভাবকহীন বাবা-মা কর্তৃক পরিত্যক্ত, ভবঘুরে শিশুরাও শ্রমিক হিসাবে কাজ করে।

সুতরাং দারিদ্রের কারণে শিশুরা প্রতিমুহূর্তে মানসিক এবং শারিরীকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। হোটেল, রেস্তোরাঁয় গ্লাস বয় কিংবা থালা-বাসন মাজার কাজে, ফুলের দোকানের ঝাড়ুদার বা ফুল বাছাই থেকে শুরু করে পাথর ও ইটের ভাটায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে এমনকি রাজনৈতিক মিছিল-মিটিং-এ ব্যানার, ফেষ্টুন টানা ও শ্লোগান ধরার কাজে থেমে নেই শিশুদের ব্যবহার। এরই কিছু বাস্তব চিত্র যা এখানে উল্লেখ করা হলো -

> ২৮ মার্চ, ২০০৬ যুবদলের সমাবেশ ১৮ এপ্রিল, ২০০৬ যুবলীগের সমাবেশ এবং ২১ এপ্রিল, ২০০৬ ইসলামী ফ্রন্টের সমাবেশে ১১ থেকে ১৫ বছরের বয়সের শিশুদের ব্যবহার করা হয়েছে। আমিন বাজার ব্রিজের নীচে বাবুলের পাথর ঘরে পাথর ভাঙ্গার কাজ করে আবু ও হেনা নামের ১০ থেকে ১২ বছর বয়সের দু'জন শিশু শ্রমিক। ম্যানেজার রুহুল হক জানালেন, আমরা ২০ বছরের নীচে কাউকে কাজে নিতে চাইনা। কিন্তু ওদের বাবা-মা এসে হাতে পায়ে ধরে তখন আর না করতে পারি না। সরকার তো আইন করে খালাস। এখানে কাজ করে ওরা প্রতিদিন ৬০/৭০ টাকা পায়। ১২/১৩ বছর বয়সের মেয়ে করুনা, নীলক্ষেত উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী করুনা আক্তার সাথী জানায় স্কুল ছুটির পর প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এখানে চা বিক্রি করি। এ থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে ঘর ভাড়া ও স্কুল খরচ হয়ে যায়। করুণার

---

[১৭] "শিশুশ্রম ও জাতীয় উন্নয়ন", *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ জুলাই, ২০০৬।

Employment of Children Act 1938-এ কয়েক রকমের কাজে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আছে। Factory Act, 1965 -এ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যে কোন কারখানায় ১৪ বছরের নীচে শিশুদের নিয়োগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে। বর্তমানে এই আইনগুলোকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী "অভিভাবক" বলতে শিশুর আইনগত হেফাজতকারী বা শিশুর উপর কর্তৃত্ব আছে এমন যে কোন ব্যক্তিকেও বুঝাবে।

[১৮] ঐ।

বৃদ্ধা মা তহুরা বেগম বলেন 'গরিবের মাইয়া পড়াশুনা কইরা ডাক্তার হইবার চায়, এখন আমি আছি তাই মাইনসের বাড়ি কাজ কইরা খাবারডা জোরাইতে পারি। আমার কিছু একটা হইলেই তো পড়াশুনা শেষ। শাহবাগের মোড়ে ফুলের দোকানগুলোর আবর্জনা পরিস্কার করে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী রোজিনা। ৮ বছর বয়সের রোজিনা বলে, আমি তো কাজ করিনা। মা এখানে কাজ করে। মা অসুস্থ তো তাই আমি বদলি দিচ্ছি। তা না হলে মায়ের বেতন কাটা যাবে। পিজি হাসপাতালের পেছনের একটি বস্তিতে রোজিনাদের বাস। ওর মা সানোনা বেগম অসুস্থ শরীরে ব্যস্ত রান্নায়। তিনি জানালেন, এখানেই এনজিও স্কুলে পড়ে তার মেয়ে। বাবা নেই। মা-মেয়ের সংসারে ফুলের দোকানের কাজটাই ভরসা। শাহবাগ মোড়ের এ ফুলের দোকানগুলোকে ঘিরে জীবিকা নির্বাহ করে বেশ ক'জন শিশু শ্রমিক।[১৯]

এগুলো হলো রাজধানী শহর ঢাকার চিত্র। পুরো বাংলাদেশের চিত্র আয়নার এ পিঠ ওপিঠের মত। দৈনিক জনকণ্ঠ ৫ই মার্চ ২০০৬-এ এরূপই একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে টাঙ্গাইলের ১১ বছর বয়সী হারুন মিয়ার কথা বলা হয়েছে। বাবার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থাকার কারণে লেখা-পড়া বন্ধ করে তাকে সাংসারের হাল ধরতে হয়েছে। হারুনের ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া করে সরকারী কর্মকর্তা হবে কিন্তু অভাবের সংসারে তা আর হলো না।[২০]

পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে নির্যাতন

স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা মানুষকে আরো অস্থির করে তুলছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যেন দেশের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থ বড় হয়ে উঠছে। এখন শুধু প্রয়োজনেই নয় বরং লোভ লালসা পূরণ করতে, ক্ষমতাবান হতে, অল্প পরিশ্রমে ধনী হতে মানুষ এমন কোন পন্থা নেই যে অবলম্বন করছে না। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। আর এর হাত হতে রক্ষা পাচ্ছে না কোমলমতি শিশুরাও, যার ফলে শিশু নির্যাতন যেমন, ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক নির্যাতন, দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, শিশু পাচার ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। নির্যাতনকারীদের উল্লেখযোগ্য অংশে রয়েছে পরিবার ও অন্যান্য জানা শোনা ব্যক্তি, যদিও অপব্যবহারের শিকার ও অপব্যবহারকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে অপব্যবহারকারীদের মধ্যে রয়েছে এলাকার ছেলে, মামাতো, ফুফাতো, চাচাতো, খালাতো বড় ভাই, প্রতিবেশী, শিক্ষক, মেহমান, চাচা ইত্যাদি। এর ফলে সবচেয়ে বেশী যে সব উপসর্গ দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে অবসাদ, আত্মহত্যার

---

[১৯] *রোববার*, ১৪ই মে, ২০০৬, পৃ: ২৪-২৫।

প্রবণতা ও অন্যকে বিশ্বাস করার শক্তি হারিয়ে ফেলা। বাংলাদেশে এরকম নির্যাতনের শিকার শিশুদের নিরাময় এবং সমাজে ফিরিয়ে আনার মতো কোন কর্মসূচী বস্তুতপক্ষে নেই।

প্রতিদিন জাতীয় মাধ্যমগুলোর দিকে তাকালে এর সত্যতা ফুটে উঠে। ২০০২ সালের ১৭ই জুলাই-এর ঘটনা। গাইবান্ধার ছোট্ট মেয়ে তৃষা। স্কুল থেকে ফিরছিল তৃষা। প্রতিদিনের মত রাস্তার পাশে ওৎ পেতে থাকা বখাটে ছেলেরা দলবেঁধে বসেছিল। তৃষাকে ওরা অযথা বিরক্ত করত যা তৃষার খুবই অপছন্দের ছিল এবং সে ভয় পেত। তৃষাকে দেখে ওরা পিছু নেয়। সে দৌড়াতে থাকে। এক সময় সে পৌছে যায় মধ্যপাড়া স্কুলের পুকুর পাড়ে। পালাবার আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে ঝাঁপ দেয় পুকুরে। জীবন দিয়ে বখাটে ছেলেগুলোর নির্যাতন থেকে সে নিজেকে রক্ষা করে।[২১]

এসিড সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এটি সাধারণত একটি মেয়ের মুখ বা শরীরে নিক্ষেপ করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত নতুন ও বিশেষভাবে বিপর্যয়কর সহিংসতা। এর সবচেয়ে সাধারণ পরিস্থিতি হলো যেখানে একটি ছেলে একটি মেয়েকে প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে হয়রানি করে, যে প্রস্তাব মেয়েটি প্রত্যাখ্যান করে বা যেখানে যৌতুকের দাবী সংশ্লিষ্ট থাকে। তাছাড়া পারিবারিক বিরোধ এবং জমি সংক্রান্ত বিরোধও সংশ্লিষ্ট থাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছেলে বা স্বামীর এসিড নিক্ষেপের লক্ষ্য থাকে মেয়েটির মুখ, দৃশ্যত: এর উদ্দেশ্য হলো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা এবং মেয়েটির ভবিষ্যৎ বিয়ের সম্ভাবনা শেষ করে দেয়া। যেসব মেয়ে এসিড নিক্ষেপের শিকার হয় তারা স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্কুলে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া, জীবন নির্বাহের জন্য আর্থিক সংস্থান ও স্বামী খুঁজে পাবার ক্ষেত্রে এক দু:সহ ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হয়। পুলিশ হামলাকারীদের অনেককেই ধরেনা। যাদের ধরা হয় তারা প্রায়ই জামিনে ছাড়া পেয়ে যায় যা এসিডের শিকার মেয়ে ও তার পরিবারের নিরাপত্তার প্রতি একটা হুমকি সৃষ্টি করে। এ নির্যাতন সারাজীবন তাদের বয়ে বেড়াতে হয়।

বাংলাদেশে নারী শিশু পাচারের মূল কারণ অভাব অনটন। এছাড়া অন্য কারণগুলোর মধ্যে আছে অজ্ঞতা, যৌতুক প্রথা, প্রাকৃতির দুর্যোগ, স্বামী পরিত্যাক্তা ইত্যাদি। প্রথম পর্যায়ে তারা কিছু বোঝার আগেই দেশের অসৎ নিয়োগকারী এজেন্সি বা দালাল দ্বারা প্রতারিত হয়ে দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়োগকারী দেশে তারা নির্যাতিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর পুনর্বাসনের সমস্যায় পড়ে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এ উল্লেখ করা হয়েছে- যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা নীতি গর্হিত কোনও কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশ থেকে আনয়ন করে

---

[২০] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৫ই মার্চ, ২০০৬।

[২১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ই অক্টোবর, ২০০৬।

বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করে বা ক্রয় বিক্রয় করে বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে নারীকে তার জিম্মায় বা দখলে রাখে তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক ২০ বছর বা অনূন্য দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডনীয় হবে এবং অর্থদণ্ডেও দন্ডনীয় হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ অনুসারে পাচারের অপরাধ বিচার করার জন্য প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে বিশেষ আদালত গঠিত হয়েছে। মামলা দায়েরের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে পাচারের অপরাধে তদন্ত এবং ১২০ দিনের মধ্যে বিচার কাজ শেষ করতে হবে। তদন্ত কালে আসামী জামিন পাবে না। আসামীর অনুপস্থিতিতেও বিচার কাজ সম্পন্ন হবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব বিচার কাজ শেষ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট যে কোন স্থানে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাক্ষীর অভাবে আসামীরা রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। তাই বাংলাদেশের নারী ও শিশু পাচার বন্ধ হচ্ছে না। বর্তমানে শিশু পাচার সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও ব্যাপক তথ্য পাওয়া যায় না। সঠিক সংখ্যা যাই হোক এটা সুস্পষ্ট যে, এই অবৈধ কাজটি বেড়ে চলেছে।[২২]

রাজশাহী মহানগরী ও আশে পাশের এলাকার সীমান্তবর্তী ঘাটগুলো দিয়ে ১৭ মাসে ১৪টি পাচারের ঘটনায় উদ্ধার করা হয় ৮০ জন নারী ও শিশুকে। আটক হয় ৬ পাচারকারী। ৮ জুন ২০০৬ পদ্মাপাড়ের বড়কুঠি দিয়ে ভারতে পাচারকালে বিডিআর ২০ জন নারী ও শিশুকে উদ্ধার করে। আটক করে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার হালচা গ্রামের নজরুল ইসলাম (৫০) নামের এক পাচারকারীকে। এর আগে গত ৪ মে ২০০৬ একই সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় বিডিআর ২৪ জনকে উদ্ধার করেছিল। ২০০২ সালে গোদাগাড়ি সুলতানগঞ্জ এলাকা থেকে পাচারের সময় আটক করা হয় ৮৪ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে। তাদের অনেককেই এর আগে একাধিকবার আটক করা হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাচার আইনে কোন মামলা না করে মামলা দেয়া হয় পাসপোর্ট আইনে। এ কারণে সংঘবদ্ধ পাচারকারী চক্রটি বারবার আইনের হাত থেকে পার পেয়ে যাচ্ছে।[২৩] বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির নির্বাহী পরিচালক সালমা আলী বলেন, "বিগত আড়াই বছরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ২,৬৫৫টি শিশু নিখোঁজ হয়েছে। এর মাঝে ২ শতাংশ অর্থাৎ ৩৫টি শিশুকে পুলিশ, বিডিআর এবং স্থানীয় লোকজন কর্তৃক উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ওই সময়ে ১২১৯টি শিশু অপহৃত এবং ১০০৭টি শিশু পাচার হয়েছে। এসব

---

[২২] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃ: ৩৭

[২৩] ঐ, পৃ. ৩৬

শিশুর বয়স ১০ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে।"[২৪] জাতীয় কন্যা শিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'কন্যা শিশু পাচার আর কতদিন' শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, পাচার করা কন্যা শিশুদের শতকরা ৯০ ভাগকেই বলপূর্বক দেহ ব্যবসায় জড়িত করা হয়। ভারতে প্রায় তিন লক্ষাধিক এবং পাকিস্তানে প্রায় দু' লক্ষাধিক বাংলাদেশের নারী ও শিশু পতিতাবৃত্তির সাথে জড়িত এবং তারা সবাই পাচারের শিকার। প্রতি বছর ২০ সহস্রাধিক শিশু-কিশোর কিশোরী বাংলাদেশ থেকে পাচার হচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শিশুকে মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি হিসাবে ব্যবহারের জন্য পাচার করা হলেও বাকী সিংহভাগের কিডনিসহ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করা হয়ে থাকে। যৌন বিকৃতি চরিতার্থ করার জন্যও শিশুদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[২৫]

নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক তথ্য কেন্দ্র ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টারের (এমএমসি) বার্ষিক প্রতিবেদন উল্লেখ করেছে ২০০৫ সালে সারাদেশে প্রায় ৮৫ লাখ নারী ও শিশু বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে। প্রতিবেদনে শিশু পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়, শিশু বিষয়ে মোটা দাগে দশটি ক্ষেত্রে মোট ৮৩৫৭টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এসব সংবাদে দেখা যায় ৮৩,৭৫,৫০০ জন শিশু বিভিন্ন নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছে। নির্যাতিতদের মধ্যে নিহত হয়েছে ৪১২৫ জন এবং আহত হয়েছে আরও ২৮৯১ জন। নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনায় মামলা হয়েছে ১৩৬৫টি এবং পূর্বের ২৫৭টি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন অভিযোগে ১৩৪৭ জনকে গ্রেফতারের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সাধারণ জনগণের সহায়তায় ১০৬৯ জন শিশুকে বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধারের তথ্য জানা গেছে। পরিবীক্ষণের আওতায় বিবেচিত সংবাদসমূহে দেখা যায় এ সময় বিভিন্নভাবে ১৯ লাখ ৬ হাজার ২০৪ জন শিশু উপকৃত হয়েছে এবং ২১ লাখ ৩১ হাজার ৯৪২ জন শিশু বিভিন্নভাবে অধিকার বঞ্চনার শিকার হয়েছে। এখানে আরো বলা হয়েছে ১৪২৭ জন শিশু যৌন নির্যাতনের ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৯৬ জনকে এবং এসব কারণে আহত হয়েছে আরো ১১৭৩ শিশু। শিশু যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে ৫৫১টি এবং ১১৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতিদিন গড়ে ৪ জন শিশু যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে।[২৬]

---

[২৪] ঐ, পৃ. ৩৭

[২৫] ঐ।

[২৬] *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ২০ জানুয়ারী ২০০৬, পৃ: ৩১-৩২।

এই রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনার মাত্রা রাজশাহী বিভাগেই সবচেয়ে বেশী, যার সংখ্যা ছিল ৪৩৩। এরপর রয়েছে ঢাকা বিভাগে ৩৩৯ জন, খুলনা বিভাগে ২২৯ জন, চট্টগ্রামে ২২৭ জন, বরিশালে ১৩৯ এবং সিলেট বিভাগে ৬০জন। প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, ২৪৩ জন শিশু যৌন হয়রানি ও ১১২৮ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৯৫ জন শিশুকে। তথ্য পরিবীক্ষণের একটি বিষয় লক্ষণীয় যে সকল শিশুরা এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তার এক চতুর্থাংশের বয়স ছিল ১ থেকে ১০ এর মধ্যে।

শিশু নির্যাতন চিত্র জানুয়ারী - ডিসেম্বর ২০০৫

বিষয়	সংবাদ সংখ্যা	শিকার	নির্যাতনের মাত্রা		মামলা	রায়	গ্রেফতার
			আহত	নিহত			
ধর্ষণ/যৌন নির্যাতন	১৪১২	১৪২৭	১১৭৩	৯৬	৫৫১	১১৬	৪০৭
অপহরণ	৮৩৬	৭৭৫	১৯	২৭	২৯৮	৫৫	৫১৯
এসিড নিক্ষেপ	৫৬	৫৩	৫২	১	১০	৮	১৮
দুর্ঘটনা	২১৫০	৩০৩৫	৪৭৪	২১৭১	৯৩	০	৮
আত্মহত্যা	৫৬২	৫৬৬	৩৪	৫৩২	১০৪	১	৩
পাচার	২২৫	৪৩৫	২	৪	৪৭	২৫	১২৪
নিখোঁজ	১৫৮	২০৪	২	১৪	২১	২৫	৮
অনাকাঙ্খিত শিশু	২০৩	২২০	২	১৩১	১৩	১	৬
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা সুযোগ	৩৬৬	৩৯৫৮	৪২০	৫৮৮	২	০	৬
বাল্য বিবাহ	২০৩	১১২	০	০	৭	০	৫
মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য	৩০	১৭	১	১৪	১	১	১
অন্যান্য	৮৫২	১১০২	৫০৭	৫৩৬	১৯৪	৪৪	১৬২
সর্বমোট	৭০৫৩	১১৯০৪	২৬৮৬	৪১১৪	১৩৪১	২৫৩	১২৬৭

সূত্রঃ *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ২০ জানুয়ারী ২০০৬, পৃ: ৩২।

পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন

সরকারের একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা। সমাজে শান্তি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার সব সময় সচেষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে পুলিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জনগণকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করা তাদের কাজ। জনগণও তাদের উপর

Scanned with CamScanner

নির্ভর করে। কিন্তু পুলিশের ভূমিকা সব সময় সন্তোষজনক হয় না। বরং এই বেশে অপরাধ করে তারা ছাড়াই পেয়ে যায়।

৪ বছরের তানিয়া ১৯৯৮ সালের ১০ মার্চ বেলা ৩টার দিকে ঢাকা মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের পুলিশের নিয়ন্ত্রিত একটি কক্ষে ধর্ষিত হয়। এ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু পুলিশ প্রকৃত ধর্ষণকারীকে বাদ দিয়ে গ্রেপ্তার করে একজন নিরীহ দরিদ্র মানুষকে। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ পত্র দাখিল করে মামলা চালানো হয়েছে। যেহেতু ঘটনাটি পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ঘটেছে এবং ঘটনার সঙ্গে পুলিশ জড়িত ছিল। তাই ওই সময়েই তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজে একজন পুলিশ হওয়ায় আরেক পুলিশকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়েছে। এই প্রতিবেদনে সীমা চৌধুরীর মামলার কথাও এসেছে। যাতে দেখা যায় - চট্টগ্রামের রাউজান থানায় পুলিশ হেফাজতে ওসির রুমে ধর্ষণ ও জেলাখানায় মৃত্যু হয় সীমার। এতেও পুলিশ কর্মকর্তারা অপরাধী পুলিশদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে।[২৭]

ফিরোজ নামে একটি নয় বছর ছেলের কথা যে তার বাবার সাথে কাজ করত। অভাবী পরিবারে সে তার বাবাকে সাহায্য করত। একটি মোবাইল ফোন চুরির অপরাধে পুলিশ তাকে আটক করে এবং তার উপর মারাত্মক নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের এক পর্যায়ে তারা তার বুড়ো আঙুল ভেঙ্গে দেয়। পুলিশি নির্যাতনে সে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসময় তার পরিবারের সাথে তাকে দেখাও করতে দেওয়া হয় না। শিশু অধিকার লঙ্ঘনের এটি একটি জঘন্য ঘটনা।[২৮]

বিচার ব্যবস্থায় শিশুদের অধিকার উন্নয়ন ও বলবৎ করার ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরোয়ানা বা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমনামা ছাড়াই সন্দেহ ভাজনকে গ্রেপ্তারের ব্যাপক ক্ষমতা তাদের রয়েছে। শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে বিচার প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে ১৯৯৪ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে পুলিশের নিয়মিত অভিযান কালে ধৃত পথশিশু ও মেয়েরা বিশেষ করে বিউটি পার্লারে কর্মরত মেয়েরা নির্যাতন ও অপব্যবহারমূলক আচরণের শিকার হয়েছে। এ ধরনের অভিযানকালে, গভীর রাতে কাজ করে বাড়ি ফেরার সময় কখনও কখনও পতিতালয়ের মেয়েদের মত অল্প বয়সী গার্মেন্টস শ্রমিকদের (পতিতা মনে করে) আটক করা হয়েছে। পুলিশকে মাঝে মাঝে কিছু বিশেষ এলাকায়, "শুদ্ধি অভিযান" চালাতে দেখা যায়। এসব অভিযানের সময় কিছুটা সন্দেহজনক বা শুধুমাত্র যথেষ্ট ভদ্রজনোচিত নয় বলে মনে হলেই যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদের মধ্যে বহু শিশু থাকে। গ্রেপ্তারের পর ভবঘুরে শিশু এবং নির্দিষ্ট অভিযোগের

---

[২৭] দৈনিক প্রথম আলো, ২ আগস্ট, ২০০৬।

[২৮] www.google.com, Torture of a child in Bangladesh.

Scanned with CamScanner

ভিত্তিতে গ্রেপ্তারকৃত শিশুদের ক্ষেত্রেও পুলিশের নির্যাতন দেখা গেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে ঢাকায় ধরার পর থানায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পতিতা মনে করে) আটক রাখার হার বেশী।[২৯]

আইনের সাথে বিরোধে পতিত শিশুর প্রতি নির্যাতন

বাংলাদেশের কিশোর বিচার ব্যবস্থা ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের আওতায় সম্পাদিত হয়। এই আইন ১৬ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি একটি ব্যাপক আইন। তাছাড়া ১৮৬০ সালের দন্ডবিধিতে শিশুদের ওপর অপরাধের দায়দায়িত্ব বর্তাবার একটা ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা আছে। যাতে বলা হয়েছে ৯ বছরের কম বয়সী কোন শিশুর কোন কাজই অপরাধ বলে গণ্য করা যাবে না এবং ৯ বছরের বেশী ও ১২ বছরের কম বয়সী এবং কৃতকর্মের প্রকৃতি ও পরিণতি বিচার করার মত যথেষ্ট পরিপক্কতা অর্জন করেনি এমন শিশুর কোন কাজও অপরাধ বলে ধরা যাবেনা। বাংলাদেশে অপরাধের দায়দায়িত্ব বর্তাবার নূন্যতম বয়স বিশ্বে সর্বনিম্ন। জাতিসংঘ সনদের ৪০ অনুচ্ছেদে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত শিশুদের অধিকার বর্ণিত হয়েছে। এ ধারায় তাদের কয়েকটি অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের প্রতি কয়েকটি আচরণের কথা বলা হয়েছে। তাদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে-

- যা তাদের মর্যাদা ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি করে।
- মানবাধিকার ও অন্যের মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধকে জোরদার করে এবং
- তাদের বয়স এবং সমাজে পুন:সমন্বিত করার বিষয় বিবেচনা করে।

অনুচ্ছেদ-৩৭ এ শিশুদের বিরুদ্ধে নির্যাতন বা অন্য কোন নিষ্ঠুর অমানবিক বা অমর্যাদাকর আচরণ বা শাস্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে ১৮ বছর বয়সের আগে সংঘটিত কোন অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাস্তবে এই আইন এবং শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ অধিকারগুলো সম্পর্কে অনেক অজ্ঞতা বিদ্যমান আর সে জন্য খুব অল্প সংখ্যক শিশুই এর সুরক্ষাগুলি ভোগ করে।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে কারাগারে আটক শিশুর সংখ্যা ছিল ৩০০ এর বেশী যার ধারণ ক্ষমতা ছিল ২০০। বিভিন্ন উপায়ে শিশুরা শেষ পর্যন্ত কারাগারে বয়স্কদের সঙ্গেই স্থান পায়।

---

[২৯] "বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার", *ইউনিসেফ*, ঢাকা, পৃ: ৬৫।

Scanned with CamScanner

শিশু আইনের দুর্বল বাস্তবায়নের ফলে বিচার ব্যবস্থায় শিশুদের প্রতি প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো আচরণ করা এবং দন্ডাদেশের পর কারাগারে পাঠিয়ে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। শিশুদের ৩০ বছর অথবা তারও বেশী সময়ের কারাদণ্ডাদেশ দেয়ার খবর পাওয়া গেছে।

- ১৬ বছরের নীচে যেসব শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে, অথচ জামিন দেওয়া হয়নি তাদের বিচার চলা পর্যন্ত ও বিচার চলাকালে কারাগারে রাখা হয়। এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী।
- কিছু কিছু শিশুকে বিশেষ করে মেয়েদের নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ও শিশু প্যাচারের শিকার।
- এছাড়া আরো কিছু শিশু রয়েছে যারা তাদের বিচারাধীন বা দণ্ডিত মায়েদের সঙ্গে আটক আছে।[৩০]

যারা বিচার কার্য পরিচালনা করছেন তারা শিশুর বয়স নিশ্চিত ভাবে না জানার কারণে শিশুরা তাদের জন্য প্রদত্ত শিশু আইনের আওতায় প্রদত্ত সুরক্ষা অনেক সময় ভোগ করতে পারে না। শিশু আইনে ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান নিষিদ্ধ। এর ফলে ১৬ ও ১৭ বছর বয়সী অপরাধী বা যাদের বয়স নিশ্চিত করে জানার কোন উপায় নেই তাদের ক্ষেত্রে কৃত অপরাধের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বা মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

এই প্রসঙ্গে ব্লাষ্ট এণ্ড ব্রাদার্স বনাম বাংলাদেশ এণ্ড আদার্স মামলার রায় উল্লেখ করা যায়। ব্লাষ্ট (Bangladesh Legal Aid & Services Trust) ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য মামলায় হাইকোর্ট রায় দেন যে, কিশোর অপরাধীদের বিচার কিশোর আদালতে হবে এবং অন্য কোন আদালত বা ট্রাইবুনালের এটি এখতিয়ার বহির্ভুত বিষয়।

এই মামলার ঘটনায় প্রকাশ - আলমগীর হোসেন নামক একজন কিশোর অপরাধীকে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫ এর ধারা ৫(খ) এবং ৫(ঘ) এর অধীনে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করা হয়। তার অপরাধ ছিল যে সে একটি মেয়ের প্রতি এসিড ছুড়ে মারে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত কুমিল্লা অভিযোগটি আমলে নেয়। বিশেষ আদালতের নজরে আসে যে, আলমগীর হোসেনের বয়স ষোল বৎসরের কম। তারপরও আদালত বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং আলমগীর হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আলমগীর হোসেন ব্লাষ্ট এর সহায়তায় হাইকোর্টে আপীল করে। হাইকোর্ট রায় দেন যে, বিশেষ আদালত আলমগীর হোসেনের বয়স ১৬ বৎসরের কম জানা সত্বেও তাকে শাস্তি দিয়েছেন যা ১৯৭৪ সালের শিশু

Scanned with CamScanner

আইনকে লঙ্ঘন করেছে। হাইকোর্ট আরো উল্লেখ করেন যে, বিশেষ আদালত বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে। রায়ে আরো বলা হয় ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ৫ অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, কিশোর অপরাধীদের অপরাধ আমলে নেওয়ার একমাত্র এখতিয়ার কিশোর আদালতের এবং শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আদালতের ১৪/১৫ বৎসর বয়সী আলমগীর হোসেনকে দণ্ডাদেশ প্রদান সম্পূর্ণ এখতিয়ার বহির্ভূত।[৩১]

উপসংহার

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শিশু নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। অন্যভাবে বললে শিশু নির্যাতন বন্ধ করতে হলে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেবল ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা জাতীয় শিশু নীতির আওতায় এসেছে। আইন দ্বারা নির্ধারিত বিভিন্ন বয়স সীমার ব্যাপারে আইনগত বিধানগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব দূর করা দরকার। পারিবারিক সহিংসতা বন্ধ, দৈহিক শাস্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ এবং বাল্য বিবাহ ও অন্যান্য ক্ষতিকর সনাতন প্রথা রোধের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজনে প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যবহৃত হতে পারে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা করা এবং স্কুলের পরিবেশের উন্নয়ন করা প্রয়োজন। শিশুশ্রম প্রথার অবসানের পাশাপাশি শিশুদের পূণর্বাসনের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে শিশুদের অনেক সমস্যার সমাধান হবে। মেয়ে শিশুদের প্রতি পরিবারের ভেতরে এবং বাইরে দুর্ব্যবহার, অপব্যবহার মোকাবেলা রোধ করার জন্য এবং আঘাত প্রাপ্ত শিশুদের পুনর্বাসন ও সমাজে ফিরিয়ে আনার কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিশু পাচারের গুরুতর সমস্যা রোধ ও মোকাবেলার লক্ষ্যে সীমান্ত সংযোগ শক্তিশালী করাসহ দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতা জোরদার করা দরকার। শিশুদের আটক ও বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ন্যায়বিচার প্রদান করা এবং যে সব শিশু আইন ভঙ্গ করেছে তাদের কোন প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ করে রাখার দণ্ডাদেশ দেয়ার পরিবর্তে তাদের পুনর্বাসনের জন্য শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, পরামর্শ তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা, তদারকী ও শিক্ষানবিশীসহ যেসব বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করা যায় তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য প্রস্তুত বিভিন্ন আইনগুলোকে সমন্বয় করা হলে এবং যে সব জটিলতা এখনও বিদ্যমান সেগুলোকে যতদ্রুত সম্ভব দূর করা হলে শিশুদের প্রাপ্য অধিকার

---

[৩০] "বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার", *ইউনিসেফ*, ঢাকা, পৃ: ৬৭।

[৩১] *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অফ ল*, খণ্ড ৬, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃ: ১৩৪-১৩৫। 7BLC (2002) 85.

Scanned with CamScanner

প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি এ. আনান বলেছেন- "আমরা যখন সকল শিশুর অধিকার অর্জনে আরো কাছাকাছি এগিয়ে যাব শুধু তখনই দেশসমূহ তাদের উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে আরো কাছাকাছি এগিয়ে যাবে।"[৩২] আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই শিশু। তাদের বাদ দিয়ে কখনই উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিশুরা বেশ কিছু অসুবিধাগ্রস্থ অবস্থার মধ্যে রয়েছে যা তাদের স্বাভাবিক বিকাশে বাঁধার সৃষ্টি করে। শিশুর অসুবিধাগ্রস্থ অবস্থা বা পর্যায়গুলো সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ ও ধারণার স্পষ্টতা প্রয়োজন। শিশুদের বেঁচে থাকা, দারিদ্রের কশাঘাত থেকে মুক্ত করা এবং মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করার উদ্যোগ নেওয়া এবং শিশুদের উপর যে অন্যায়, শোষণ এবং অমানবিক আচরণগুলো করা হয় তা বন্ধ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার, রাজনীতিবিদসহ দেশের সকল মানুষকে আন্তরিক হতে হবে। তাহলেই শিশু নির্যাতন বন্ধ ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

[৩২] "বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি-২০০৫", ইউনিসেফ, ঢাকা, বাংলাদেশ।